গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ

অন্ধতী রায়

নব উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক নব - ফ্যাসিবাদ

কয়েকদিন আগে এক তণ কাশ্মীরি বন্ধু আমাকে কাশ্মীরের মানুষের জীবন সম্পর্কে বলেছিলেন। বলেছিলেন রাজনৈতিক অসততা ও সুবিধেবাদের ফাঁদ, নিরাপত্তাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে, বলেছিলেন এমন এক সমাজের কথা যা সন্ত্রাসে সংপৃত্ত, যেখানে জঙ্গি, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী, সরকারি চাকুরে, ব্যবসায়ী, এমনকি সাংবাদিকরাও পরস্পরের বিদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে, আর ত্রমশ পরে, একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে। সীমাহীন হত্যা, বেড়ে - ওঠা - ওঠা "নিখোঁজ" এর তালিকা, ফিশফশানি, ভয়, অমীমাংসিত গুজব, আর বাস্তবিক যা ঘটে চলেছে, কাশ্মীরিরা যা জানে এবং কাশ্মীরে যা ঘটেছে সে - সম্পর্কে বাকি আমাদের যা জানানো হয় এ দুয়ের ভেতবের চূড়ান্ত নির্বোধ বিরোধ -- তিনি বলছিলেন এসবের মধ্যে বসবাসের অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলছিলেন 'কাশ্মীর কারবারের ব্যাপার ছিল। এখন তা একটা উন্মাদাগার।'

তাঁর ঐ মন্তব্যটি সম্পর্কে আমি যতই ভেবেছি ততই আমার মনে হয়েছে সমগ্র ভারত সম্পর্কেই এটা যথার্থ একটা কথা। সন্দেহ নেই, কাশ্মীর এবং উত্তর - পূর্ব ভারত সেই উন্মাদাগারের দুটি আলাদা আলাদা বিপদজনক ওয়ার্ড হিশেবে গণ্য হবে। কিন্তু হৃদ্‌ভূমিতেও জ্ঞান এবং তথ্যের মধ্যে যে ফারাক, যা আমরা জানি এবং যা আমাদের বলা হয়, যা অজানা এবং যা নিশ্চিত বলে চালানো হয়, যা গোপন রাখা হচ্ছে ও যা প্রকাশ করা হচ্ছে, সত্য ঘটনা ও আন্দাজ, 'বস্তুগত' জগৎ আর কল্পিত জগত - এসবের মধ্যে যে ব্যবধান--- তা সীমাহীন অনুমান আর উর্বর উন্মাদনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এ হলো একটা বিষাত্ত পাঁচন যা অল্প আঁচে ফোটানো হচ্ছে, নাড়া হচ্ছে, আর সবচেয়ে কুৎসিত, ধবংসাত্মক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যখনই কোনো তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা' ঘটে তখনই, নামমাত্র অনুসন্ধান করে কিংবা অনুসন্ধান না করেই সরকার দোষীদের সাব্যস্ত করতে অত্যুৎসাহী অতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। গোধরাতে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানো, ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবনে আত্রমণ, অথবা চিত্তিসিংপুরায় তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদীদের' দ্বারা শিখ - হত্যা ---এগুলো তার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা বড় আকারের সংবাদ - শিরোনাম পেয়েছে। আর এসব ঘটনায় যা সম্ভাব্য প্রমাণ হিশেবে সামনে আনা হয়েছে তা অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরে এবং তাই তড়িঘড়ি বিষয়গুলোকেঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোধরার ঘটনাটাই ধন, যখনই ঘটনাটা ঘটল তৎমুহূর্তেই স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষনা করে দিলেন এটা আই এস আই -এর ছক। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলল মুসলমানদের একটা দল পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে কাজটি করেছে। অনেক গুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্র দেওয়া হল না। অনন্ত আন্দাজের ব্যাপার থেকে গেল। যে যা বিশ্বাস করতে চায় বিশ্বাস করল। কিন্তু ঘটনাটা অসূকভাবে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে চাবকে জাগিয়ে তুলল।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি ঘিরে আমেরিকা সরকার অনেক মিথ্যে ও ভুল - তথ্যের জন্ম দিয়েছিল একটা নয়, দুটো দেশকে আত্রমণ করার লক্ষ্যে। ঈশ্বর জানেন তার ভাঁড়ারে আর কী লুকোনো আছে!

ভারত সরকারও সেই একই কৌশল ব্যবহার করছে - অবশ্য তার লক্ষ্য কোনো অন্য দেশ নয়, নিজের দেশের মানুষ। গত দশকে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে মৃত মানুষের সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে বোম্বের

পুলিশকর্মীরা সংবাদমাধ্যমে খোলাখুলিই বলেছেন 'নির্দেশ' মেনে তাঁরা কত 'দুর্বৃত্ত'কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ জানিয়েছে এক বছরে ২০০ জন 'চরমপন্থীর ' 'এনকাউন্টারে' মৃত্যুর কথা। কাশ্মীরের অবস্থাটা প্রায় যুদ্ধ - পরিস্থিতির মতো, সেখানে ১৯৮৯ থেকে এখন পর্যন্ত ৮০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে 'নিখোঁজ'। নিখোঁজ মানুষদের অভিভাবকদের সমিতির (APDP) তথ্য অনুসারে ২০০৩ সালেকাশ্মীরে ৩০০০ মানুষ নিহত হয়, যার মধ্যে ৪৬৩ জন সেনাবাহিনীর লোক। 'শুশ্রূষার স্পর্শ' এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০২ সালের অক্টোবরে মুফতি মহম্মদ সঈদের সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে, এ পি ডি পি-র তথ্য অনুযায়ী, ৫৪ জন জেলবন্দীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই অতি - জাতীয়তাবাদের যুগে যতক্ষণ দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসবাদী, বিদ্রোহী বা চরমপন্থীর লেবেল সেঁটে মানুষকে হত্যা করা যাবে ততক্ষণ হত্যাকারীরা জাতীয় স্বার্থের রক্ষক হিশেবে সদর্পে বিচরণ করতে পারবে এবং কারো কাছে কোনো উত্তর দেবার দায় তারা স্বীকার করবে না।

মানুষকে হয়রানি ও সন্ত্রস্ত করার দিকে ভারত রাষ্ট্রের ঝোঁকটি পোটা আইনের (Prevention of Terrorism Act.) দ্বারা অনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। দশটি রাজ্যে এই আইন জারি হয়েছে। পোটার বিষয়ে খুব দ্রুত চোখ চালিয়ে দেখলে আপনি বুঝবেন আইনটি অত্যন্ত কড়া এবং সর্বব্যাপী। আইনটি এমন বহুমখী এমন সর্বসঞ্চারী যে এটি যে-কারোর বিদ্ধে প্রয়োগ করা যায় -- বিস্ফোরক সমেত ধৃত কোনো আল - কায়দার কর্মী থেকে শু করে কোনো আদিবাসী যিনি নিমগাছের তলায় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন অথবা আপনি বা আমি সকলেই এই আইনের আওতায় চলে আসতে পারি। সরকার যা চাইবে তা-ই হতে পারবে--- পোটার মাহাত্ম্য হল এই। যারা আমাদের শাসন করছে আমরা তাদের সম্মতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। তামিলনাড়ুতে সরকারের সমালোচনাকেধ্বাসদ্ধ করার জন্য পোটা ব্যবহার করা হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে ৩২০০ জন মানুষ - যাঁদের বেশির ভাগ আদিবাসী - মাওবাদী হওয়ার অপরাধে তাঁদের নামে পোটার অধীনে এফ আই আর করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে যাঁরা জমি থেকে উচ্ছেদের বিদ্ধে আর বেঁচে থাকার অধিকারের দাবিতে প্রতিবাদ করছেন এই আইন তাঁদের দমিয়ে রাখার উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। গুজরাত ও মুম্বাইএ এটা প্রায় সর্বাত্মকভাবে মুসলমানদের বিদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০২ সালের পর গুজরাতে রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট পরিকল্পনায় ২০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, ১,৫০,০০০ মানুষকে গৃহছাড়া করা হয়েছে এবং ২৭৮ জনকে পোটার অধীনে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর ভেতর ২৮৬ জন মুসলমান আর মাত্র একজন শিখ! পুলিশি হেফাজতে যে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় পোটা আইনে তা বিচারের প্রমাণ হিশেবে গণ্য হয়। ফলে পোটা - রাজত্বে পুলিশি অনুসন্ধানের জায়গা নিয়েছে পুলিশি নির্যাতন। এতে ফলটা পাওয়া যায় দ্রুত, সরকারি ব্যয় হয় কম, এবং ফল পাওয়া যায় নিশ্চিতভাবেই।

গত মাসে পোটার পিলস্ ট্রাইবুনালে আমি একজন সদস্য হিশেবে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের এই চমৎকার গণতন্ত্রে কী ঘটছে সেসবের মর্মান্তিক সাক্ষ্যগুলি দু-দিন ধরে আমরা শুনলাম। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন আমাদের পুলিশ - স্টেশনগুলোতে সবই সম্ভব জোর করে মানুষকে মূত্রপান করানো থেকে শু করে, নগ্ন করা, হেনস্থা করা,ইলেকট্রিক শক দেওয়া , সিগারেটের ছাঁকায় পুড়িয়ে দেওয়া, পায়ুতে লোহার রড প্রবেশ করানো, ঘুষি - মেরে লাথি মেরে মৃত্যু পর্যন্ত সবই সেখানে হয়।

পোটা আদালত জনসাধারণের নজরদারির জন্য খোলা নয়। যতক্ষণ না দোষ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ একজন মানুষকে নিরপরাধ বিবেচনা করতে হবে - ফৌজদারি মামলায় এই স্বীকৃত বিধিটি পোটায় উল্টে যায়। পোটার অধীনে আপনি যতক্ষণ না নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছেন ততক্ষণ আপনি ছাড়া পাবেন না। -- যদিও আপনার বিদ্ধে অভিযোগটা সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের করা হবে না। প্রকরণগতভাবে আমরা এই দেশে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। পোটার দুর্ব্যবহার হচ্ছে এমন ভাবাটা সরলতামাত্র। ব্যাপারটা বরং উল্টো। যে কারণে এই আইন তৈরি হয়েছে যথার্থভাবে সেই কারণেই তা ব্যবহৃত হয়। অবশ্য মালিমথ কমিটির সুপারিশ মানলে শীঘ্রই পোটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হবে। মালিমথা কমিটি সুপারিশ করেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ ফৌজদারি আইনকে পোটা - ব্যবস্থার পথে নিয়ে আসা দরকার। তাহলে কোথাও কোনো ফৌজদারি অপরাধী থাকবে না। থাকবে শুধু সন্ত্রাসবাদীরা। ব্যাপারটা বেশ নির্জলা।

আজ জম্মু ও কাশ্মীরে এবং উত্তর - পূর্ব ভারতের অনেকগুলো রাজ্যে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতার আইন (Armed

Forces Special Powers Act) শুধু সেনাবাহিনীর অফিসারদের নয়, জুনিয়ার কমিশনড অফিসার এবং নন-কমিশনড অফিসারদেরও অনুমোদন দিয়েছে যে তারা কোনো ব্যক্তি সরকারি নির্দেশ অমান্য করছে বা অস্ত্র বহন করছে এমন সন্দেহ করলে তার ওপর বল প্রয়োগ করতে পারে (এবং এমনকি মেরে ফেলতেও পারে)। শুধু সন্দেহের বশে! ভারতে যারা বাস করেন তারা জানেন পরিণতিটা কোন্ দিকে এগোয়। নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা নির্যাতন, নিখোঁজ হওয়া, অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের যে -সব তথ্য প্রকাশিত সেটাই আপনার রক্তকে শীতল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এসব সত্বেও আন্তর্জতিক গোষ্ঠী এবং নিজের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ভারত যে আইনসিদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় --- সেটাই তার জয়।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য লর্ড লিনলিথগো যে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন, সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতার আইনটি তারই কঠিনতর রূপ। ১৯৫৮ সালে মণিপুরের কোনো অঞ্চলকেযখন উপদ্রুত এলাকা হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তখন সেখানে আইনটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬৫তে মিজোরাম তখনও আসামের অন্তর্গত, সমস্ত মিজোরামকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হল। ১৯৭২ সালে আইনটি ত্রিপুরা অবধি তার সীমা বাড়াল। ১৯৮০ তে সমগ্র মণিপুর উপদ্রুত বলে ঘোষিত হল। এরকম পীড়নমূলক পদক্ষেপ যে আসলে উল্টো প্রতিক্রিয়া জাগাচ্ছে এবং কেবল মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে তা বোঝার জন্য কি আর অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন আছে?

মানুষকে দমিয়ে রাখার, নিশ্চিহ্ন করে দেবার এই অসমীচীন আগ্রহের সঙ্গে মিশেছে, যে-সব মামলাগুলোয় যথেষ্ট প্রমাণ আছে সেগুলোর তদন্ত করার এবং নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্রের নেহাৎই গোপন অনাগ্রহ। ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে ৩০০০ শিখ-নিধন, ১৯৯৩ সালে বোম্বেতে এবং ২০০২ সালে গুজরাতে মুসলমান নিধন, কয়েকবছর আগে জওহরলাল নেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি চন্দ্রশেখরের হত্যা, বারো বছর আগে ছত্রিশগড় মুক্তি মোর্চার শঙ্কর গুহ নিয়োগীর হত্যা এ সবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। যখন রাষ্ট্র আপনার বিদ্ধে দণ্ডায়মান তখন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যাবলি এবং অপরাধের নিশ্চিত প্রমাণবলি - কোনোকিছুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না।

এরই মধ্যে বড়ো বড়ো খবরের কাগজের পাতা থেকে অর্থনীতিবিদরা উল্লসিত স্বরে আমাদের জানাচ্ছেন গড় জাতীয় উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব, অতুলনীয়। দোকানগুলো ভোগ্যপণ্যে উপচে পড়ছে। সরকারিগুদামগুলোতে খাদ্যশস্য উপছে পড়ছে। আর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনাহার ও অপুষ্টির সংবাদ আসছে। তবু সরকারর ৬৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য গোলাঘরে পচতে দিল। ভারতের গরিব মানুষদের দিতে নারাজ ভারতসরকার ১২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করল এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত দামে বিক্রি করল। বিখ্যাত কৃষি - অর্থনীতিবিদ উৎসপট্টনায়েক সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত এক শতকে ভারতে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তি খাদ্যশস্য গ্রহণের হিশেব করছেন। তাঁর হিশেব অনুযায়ী ১৯৯০ এর গোড়ার দিক থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এখানে খাদ্যশস্য গ্রহণের পরিমাণ যাহয়েছে সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন পরিমাণের থেকেও কম, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় যে দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায় সে - সময়ও ভারতবাসী এর বেশি খাদ্যশস্য গ্রহণ করত। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাজ থেকে আমরা জেনেছি গণতন্ত্র অনাহারে মৃত্যুকে দয়া দেখায় না। 'স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমে' যে বিরূপ সমালোচনা বেরয় গণতন্ত্র বরং তাকে আক্রমণ করতে চায়। সুতরাং অপুষ্টির বিপদজনক মাত্রা এবং চিরস্থায়ী ক্ষিধে আজকের দিনে প্রত্যাশিত আদর্শহিশেবে বিবেচিতহয়। তিন বছরের নিচের ৪৭ শতাংশ ভারতীয় শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, ৪৬ শতাংশের বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। উৎস পট্টনায়েকের লেখায় প্রকাশ ভারতের গ্রামের ৪০ শতাংশ মানুষ যে পরিমাণ খাদ্যশস্য খেতে পায় সেটা আফ্রিকার সাহারার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির মানুষদের সমান। ১৯৯০এর গোড়ার দিকে গ্রামের একটি পরিবার যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পেত এখন তারা তার থেকে বছরে প্রায় ১০০ কেজি কম খাদ্য পায়। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে গ্রাম ও শহবের আয়ের বৈষম্য গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে মারত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু ভারতের শহরগুলোর যেখানেই আপনি যান---দোকান, রেস্তোরাঁ, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জিমনেশিয়াম, হাসপাতাল---সর্বত্রই আপনি দেখবেন টিভির পর্দায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই সত্যি হয়ে উঠেছে। ভারতের উদয়, ভালো থাকার অনুভব। শুধু আপনাকে কান বন্ধ করে রাখতে হবে যখন কারো পাঁজরে পুলিশের বুটের ভয়ঙ্কর মচ্‌মচ্ শব্দ শুনবেন, শুধু হতকুৎসিত স্থান বস্তি থেকে রাস্তার শতছিন্ন ভগ্ন মানুষগুলির থেকে আপনার দৃষ্টি উপরে তুলে রাখতে হবে,

আর তাহলেই আপনি স্বস্তিকর একটা টিভির পর্দা খুঁজে পাবেন, আর অন্য একটা সৌন্দর্যের জগতে পৌঁছে যাবেন। বলিউডের চিরস্থায়ী তলপেট দোলানো নাচ - গানের জগৎ, চিরস্থায়ী সুবিধেপ্রাপ্ত চিরস্থায়ী সুখী ভারতীয়রা তিন - রঙা পতাকা দোলাচ্ছে আর ভালো থাকা অনুভব করছে। বলা কঠিন হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অলীক। পোটার মতো আইনগুলো টিভির মতো দরিদ্র, ঝামেলাবাজ, অবাঞ্ছিত মানুষদের আপনি শুধু সুইচ টিপেই মুছে ফেলতে পারেন।

নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। একে কি নব- বিচ্ছিন্নতাবাদ বলব? এ হল পুরনো বিচ্ছিন্নতাবাদের উল্টো। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের চরিত্রটা এমন--- যেখানে মানুষ একেবারে ভিন্ন অর্থনীতির অংশ হয়ে, ভিন্ন দেশ ভিন্ন গ্রহের অংশ হয়েও একসঙ্গে থাকার ভান করে। এই বিচ্ছিন্নতা এমনই যে এখানে তুলনামূলকভাবে জনসাধারণের একটা ক্ষুদ্র অংশ বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকারী হয়- তারাই জনসাধারণের বৃহৎ অংশকে বাদ দিয়ে জমি নদী জল স্বাধীনতা নিরাপত্তা মর্যাদা মৌল অধিকারসমূহ, এমনকি প্রতিবাদের অধিকারও ভোগ করতে পারে। এই বিচ্ছিন্নতার আকারটি উল্লম্ব, অনুভূমিক নয়, আঞ্চলিক নয়। এটাই হল সত্যকার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস--- সেখানে উদয় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, যেখানে ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ইন্ডিয়া দ্য পাবলিক এন্টারপ্রাইজ থেকে আলাদা।

এটা হল এমন এক বিচ্ছিন্নতা যেখানে রাষ্ট্রের গড়ে তোলা উপরিকাঠামো, উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহ --জল, বিদ্যুৎ, পরিবহন, দূর - সংযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ---এসব যা কিছু ভারতরাষ্ট্র তার জিম্মায় রেখেছিল, সে যে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের বিশ্বাসে ভর করে, এসব সম্পদ যা দশকের পর দশক ধরে জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠেছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে--- সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে -- ৭০ কোটি মানুষ--গ্রামে বসবাস করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তাঁদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। তাই প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কেড়ে নিয়ে ব্যক্তি মালিকানার কোম্পানিগুলোর কাছে বেচে দিলে বর্বরোচিত মাত্রায় তাঁদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

অল্প কিছু কর্পোরেশন এবং অবশ্য বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানা দখলের দিকে এগোচ্ছে। কম্পানিগুলোর বড় বড় অফিসাররা এই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে--- এ দেশের উপরিকাঠামো এবং ব্যবহারযোগ্য সম্পদ, এর সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকগণ সবই তাদের অধীন, জনসাধারণের কোনো অধিকারই এখানে নেই। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে গণনার অতীত--- আইনগতভাবে, সামাজিকভাবে, নৈতিক ও রাজনৈতিক কোনোভাবেই তাঁরা গণ্য হন না। যাঁরা বলেন এইসব বড় বড় অফিসারদের কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীদের থেকেও ক্ষমতাশালী তাঁরা জানেন তাঁরা আসলে কী বলতে চাইছেন।

এর অর্থনৈতিক নিহিতার্থের কথা ছেড়েই দিন --- রহস্যময়, দক্ষ, অত্যাশ্চর্য ইত্যাদি বলে যদি তার পঞ্চমুখ প্রশংসা করাও যায় (যা আসলে কার যায় না)---এর রাজনীতি কি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য? যদি ভারত রাষ্ট্র অল্প কয়েকটি কর্পোরেশনের কাছে নিজের দায়িত্বভার বন্ধক দিতে চায় তাহলে যে ভোটসর্বস্ব গণতন্ত্রের নাটক এই এখন আমাদের চারপাশে তীক্ষ্ণস্বরে নিজেকে জানান দিচ্ছে তা কি সম্পূর্ণ অর্থহীন? অথবা এর একটা ভূমিকা তখও থেকে যাবে?

মুক্ত বাজারের (যা আসলে কোনোমতেই মুক্ত নয়) জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং ভীষণভাবেই প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্রের ভেতর বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গরিব দেশগুলোর রাষ্ট্র গরিবদের জন্য কাজকর্ম কমিয়ে দেয়। কর্পোরেশনগুলো প্রচুর মুনাফার যে 'পিরিতের বোঝাপড়ার' জন্য ছোঁকছোঁক করে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সেই বোঝাপড়ার নিষ্পত্তি হওয়া এবং সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। আজকের দিনে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিশ্বায়নের প্রয়োজনে দরিদ্রতর দেশগুলোতে অনুগত দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী সরকারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলেই সেই দেশগুলোকে জনবিরোধী সংস্কার কাজে বাধ্য করানো যায়, সেখানের বিদ্রোহ শান্ত করা যায়। একেই বলা হয় 'বিনিয়োগের ভালো পরিবেশ তৈরি করা।'।

এই নির্বাচনে যখন আমরা ভোট দেব তখন আসলে আমরা বেছে নেব কোন্‌ রাজনৈতিক দলটি রাষ্ট্রের দমনমূলক পীড়নমূলক ক্ষমতাকে বিনিয়োগ করতে পারবে।

ভারতে এই মুহূর্তে আমরা একদিকে নব - উদারনৈতিক ধনতন্ত্র এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক নব-ফ্যাসিবাদের বিপদজনক

বিপরীত স্রোতের সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছি। যদিও ধনতন্ত্র এখনো সম্পূর্ণভাবে তার জেল্লা হারায় নি তাই ফ্যাসিবাদ শব্দটা ব্যবহারে কখনো কখনো আপত্তি ওঠে। শব্দটি কি আমরা আলগাভাবে ব্যবহার করছি?আমরা কি আমাদের পরিস্থিতিটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখছি? আমরা নিত্যদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছি তাকে কি ফ্যাসিবাদ আখ্যা দেওয়া চলে?

যখন একটা সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২০০০ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পরিকল্পনাকে কম - বেশি খোল াখুলিভাবে সমর্থন করে, তা কি ফ্যাসিবাদ? যখন সে সম্প্রদায়ের নারীদের প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা হয় এবং জ্যান্ত পুড়িয়ে ম ারা হয়, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? এসব ঘটনার জন্য যাতে কেউ শাস্তি না পায়, শাসক সম্প্রদায় যখন সেদিকে নজর রাখে, তখন সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন ১,৫০০,০০০ মানুষকে গৃহছাড়া করা হয়, তাদের বিচ্ছিন্ন কোণ - ঠাসা করে রাখা হয়, অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়--- সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যে সাংস্কৃতিকসংঘটি সারা দেশে ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে চায় তারা যখন তাদের কাজে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রী বিলগ্নীকরণমন্ত্রীর সম্মান ও প্রশংসা দাবি করে, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন প্রতিবাদকারী চিত্রশিল্পী লেখক বিদ্বান ও চিত্রপরিচালকতাঁদের প্রতিবাদের জন্য অপমানিত হন, হুমকি শোনান, যখন তাঁদের শিল্পকর্মকে পুড়িয়ে দেওয়া, নিষিদ্ধ বা ধবংস করা হয়--- তখন সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন একটা সরকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস বইতে খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তনের জন্য হুকুমনামা জারি করে, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন দাঙ্গাবাজেরা প্রাচীন ঐতিহাসিক নথি রক্ষণাগারগুলি আক্রমণ করে, পুড়িয়ে দেয়, যখন ছোটখাটো প্রত্যেক র াজনৈতিক নেতা মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদহওয়ার ভান করে, যখন ভিত্তিহীন জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে কষ্টা র্জিত পাণ্ডিত্যকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়, সেটাকি ফ্যাসিবাদ? যখন খুন ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাবাজদের বিচারে ঘটন াগুলো ক্ষমতাসীন দল ও তার মজুত করা পোষা বুদ্ধিজীবীরা এই বলে উপেক্ষা করে যে এগুলো বহু শতাব্দী আগের কে ানো সত্যি বা কাল্পনিক ঐতিহাসিকভুলের প্রতিক্রিয়া--- তখন সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন মধ্যবিত্ত শ্রেনী এবং পয়সাঅলা লোকেরা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে 'ছিঃ ছিঃ' বলে, আর তারপর যেমন ছিল তেমনভাবেই জীবন কাটিয়ে যায়--- সেটা কি ফ্যা সিবাদ? যিনি এ সমস্ত কাজের সম্পাদকের ভূমিকা গ্রহণ করছেন, সে প্রধানমন্ত্রীকে যখন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক ও দূরদর্শী বলে প্রশংসা করা হয়, তখন আমরা কি পূর্ণ - প্রস্ফুটিত ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করছি না?

শোষিত ও নির্জিত মানুষদের ইতিহাসে বড় অংশ এখনও পঞ্জীবদ্ধ করা হয় নি এটা সত্য, আর সেটা শুধুমাত্র সবর্ণ হিন্দুদের ক্ষেত্রেই খাটে না। যদি কোনো ঐতিহাসিক ভুলের প্রতিশোধ নেবার রাজনীতি আমাদের অভিপ্রেত পথ হয়, ত াহলে ভারতের দলিত ও আদিবাসীদের নিশ্চয় অধিকার আছে খুন অগ্নিসংযোগ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ধবংসের পথ বেছে নেবার?

রাশিয়ার মানুষেরা বলেন অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ভারতে বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি কথাটা কতখানি সত্য। এখন সমস্ত 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষরা' প্রত্যাশা করছেন বাবরি মসজিদের নিচে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য হচ্ছে তাতে নিশ্চয় রাম মন্দিরের ধবংসাবশেষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটা যদি সত্যি হয় যে প্রত্যেকটি মসজিদের নিচে একটা করে হিন্দু মন্দির আছে, তাহলে মন্দিরটির নিচে কী আছে? সম্ভবত অন্য কে ানো হিন্দু মন্দির, অন্য কোনো ঈশ্বরের। সম্ববত কোনো বৌদ্ধস্তূপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো আদিবাসী থান। সবর্ণ হিন্দুত্বের থেকে ইতিহাসের শু হয় নি, হয়েছে কি? কত গভীরে আমরা খুঁড়ব? কতখানি ওলটপালট করব? যে মুসলম ানেরা সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক অবিচ্ছেদ্য ভারতের অংশ, কেন তাদের বহিরাগত, আক্রমণক ারী বলে নিষ্ঠুর লক্ষ্যে পরিণত করা হবে? আর যে- দেশটা দু-শতাব্দী ধরে আমাদের উপনিবেশ করে রেখেছিল, সেই দেশের সরকারের সঙ্গে এ দেশের সরকার ভারতের উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য পাবে বলে বাণিজ্যিক রফা ও চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যস্ত থাকবে? ১৮৭২ থেকে ১৮৯২---সেই মহা - দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরছিল, তখনও ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডে খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি অব্যাহত রেখেছিল। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে সে - সময় ১ কো টি ২০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। সংখ্যাটা প্রতিশোধের রাজনীতির উপযুক্ত, নয় কি? অথবা প্রতিহিংসাটা কেবলই মজার যদি প্রতিহিংসার বলি যারা তারা হতদরিদ্র হয়, যদি সহজেই তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়। সফল ফ্যাসিবাদ একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়েছে। আর তাই বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ বানানো হচ্ছে।

ব্যাপারটা বেশ আগ্রহের ভারতের সেই সময়কার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন মুক্ত- অর্থনীতির জন্য ভারতের বাজার প্রস্তুত করছেন, তখন লালকৃষ্ণ আদবানী তাঁর প্রথম রথযাত্রায় সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের তেলসিঞ্চন করছেন এবং নব - ফ্যাসিবাদের জন্য আমাদের প্রস্তুত করছেন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে দাঙ্গাবাজরা বাবরি মসজিদ ধবংস করেছিল। ১৯৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার এনরনের সঙ্গে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি সই করল। ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানায় এটাই প্রথম বিদ্যুৎ প্রকল্প। সর্বনাশা বলে প্রমাণিত এনরণ চুক্তি ভারতে বেসরকারি যুগের সূত্রপাত ঘটাল। এখন কংগ্রেস যখন সীমারেখার বাইরে থেকে চেঁচামেচি করল, বিজেপি তখন লাঠিটি কেড়ে নিয়েছে। সরকার এখন দু-হাতে অসাধারণ তাল দিচ্ছে। একহাতে যখন সে জাতীয় সম্পদের বড় বড় চাঙরগুলো বেচেদিতে ব্যস্ত, তখন অন্য হাতে, মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবার জন্য, শেয়াল কুকুরের মতো চেঁচামেচি করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সমবেদত সঙ্গীত গাইছে। একদিকের নির্মম নিষ্ঠুরতায় প্রত্যক্ষভাবে মদত দিচ্ছে অন্যদিকের উন্মত্ততাকে।

অর্থনৈতিকভাবেও এই দ্বৈত সঙ্গীত বেশ বাস্তবোপযোগী আদর্শ। নির্বিচার বেসরকারিকরণে উদ্ভূত বিশাল মুনাফার (এবং 'ভারত উদয়' এর সঞ্চিত সুদ) একটা অংশ হিন্দুত্ববাহিনীর আর্থিক সহায়তার জন্য খরচ করা যাচ্ছে---রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং আরো অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট যারা বিদ্যালয়হাসপাতাল ও সমাজ সেবার কাজ করছে তারা এখান থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। আর এসবের ভেতরে সারা দেশ জুড়ে আছে হাজার হাজার শাখা। একদিকে তাদের ছড়ানো ঘৃণা, আর অন্যদিকে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন পরিকল্পনায়যে নির্মম দারিদ্র্য ও বঞ্চনা দেখা যাচ্ছে তার ফলে উদ্ভূত অনিয়ন্ত্রণসাধ্য হতাশা--- এ দুয়ের মিশ্রণে গরিবের ওপর গরিবের সন্ত্রাসে মদত দেওয়া যাচ্ছে--- একটা নিখুঁত ধোঁয়ার পর্দা তৈরি করা যাচ্ছে যার আড়ালে ক্ষমতার কাঠামোটিঅটুট ও অপ্রতিস্পর্ধী থেকে যেতে পারছে। অবশ্য, শুধু মানুষের হতাশাকে সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেওয়াটাই সবসময় যথেষ্ট নয়। বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ তৈরি'র জন্য মাঝেমধ্যে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেরও দরকার পড়ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানরত নিরস্ত্র মানুষদের ওপর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা আদিবাসী,পুলিশ বারবার গুলি চালিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের নাগরমারে, মধ্যপ্রদেশে মেহন্দিখেদায়, গুজরাতের উমরগাঁওয়ে, উড়িষ্যার রায়গর ও চিলিকায়, কেরালার মুথাঙ্গায়--- মানুষকে হত্যা করা হল।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই যাঁদের ওপর গুলি চালানো হল তড়িঘড়ি তাঁদের জঙ্গি (পি ডলবিউজি, এমন সি সি, আই, এল টি টি ই) আখ্যা দেওয়া হল। পীড়ন বেড়েই চলেছে---জম্বুদ্বীপ কাশীপুর মইকঞ্জে।

যখন বলিরা আর বলি হতে রাজি নয় তখন তাঁদের বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী এবং তাঁদের সেরকমভাবেই মোকাবিলা করা হচ্ছে। অসম্মতির রোগে পোটা হচ্ছে সেই অ্যান্টিবায়োটিক যা দিয়ে নানা রোগ সারানো যায়। এই যুদ্ধও সন্ত্রাসের যুগে মানুষের অধিকার সুরক্ষা বৃদ্ধির পক্ষে এ বছর রাষ্ট্রপুঞ্জে ১৮১টি দেশ ভোট দিয়েছিল। এমনকি আমেরিকাও এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ভারত বিরত থেকেছে। পূর্ণমাত্রায় মানুষের অধিকারসমূহে আত্রমণ হানার জন্য রঙ্গমঞ্চ তৈরি।

ত্রমশ হিংস্র রাষ্ট্রের আত্রমণকে তাহলে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ করবে কিভাবে?

অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রটা আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে, অজস্র অহিংস গণপ্রতিরোধ সংগ্রাম একটা দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, এবং তারা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করছে, এখন তাদের পথ পরিবর্তনের দরকার। পথ কি হবে সে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর বিরাট মেকরণ ঘটেছে। কিছু মানুষ ভাবছেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথটাই এমমাত্র খোলা। অন্যেরা উপলব্ধি করতে শু করছেন নির্বচনী রাজনীতিতে তাঁদের যোগ দেওয়া দরকার--- ব্যবস্থার ভেতর প্রবেশ করে দরকষাকষি করতে হবে। (কাশ্মীরের মানুষদেরও কি এই একই বেছে নেওয়ার সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না?) যেটা মনে রাখা দরকার পদ্ধতির এই আমূল পার্থক্য সত্ত্বেও দুটো পক্ষই একটা বিশ্বাসে আস্থাশীল (নিষ্ঠুরভাবে বললে যা বলা যায়) --- যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

এই বিতর্কটাই ভারতের এখন সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ বিতর্ক। এই বিতর্ক থেকে যা বেরিয়ে আসবে তা ভালোহোক আর মন্দই হোক--- এ দেশের জীবনযাত্রার গুণগত মান বদলে দেবে। বদলে দেবে সবার। ধনী দরিদ্র গ্রামীণ শহুরে - সবার।

সশস্ত্র সংগ্রাম রাষ্ট্রের প্রচণ্ড গতির সন্ত্রাসকে আহ্বান করে আনে। কাশ্মীর ও উত্তর - পূর্ব ভারতে আমরা যেমন ফাঁদ বিস্তার হতে দেখেছি।

তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমন পরামর্শ দিচ্ছেন কি সেটা করব? অসম্মতি ত্যাগ করে নির্বাচনী রাজনীতির কলহে প্রবেশ করব? লোক দেখানো নাচনকোঁদনে যোগ দেব? যোগ দেব সেই তুমুল পারস্পরিক অর্থহীন কাদা ছোড়াছুড়িতে যার উদ্দেশ্য আসলে ভেতরে ভেতরে পরস্পরের মধ্যে যে প্রায় চরম বোঝাপড়া আছে তাকে আড়ালকরা? ভোলা যায় না যে প্রত্যেকটি বড় বড় ব্যাপারে --- পারমাণবিক বোমা, বড় বাঁধসমূহ, বাবরি মসজিদ বিতর্ক এবং বেসরকারিকরণে কংগ্রেস বীজ বুনেছে আর বিজেপি সেই কুৎসিত ফসল ঝেঁটিয়ে ঘরে তুলেছে।

এর অর্থ এই নয় যে লোকসভার কোনো গুত্ব নেই এবং নির্বাচনকে অস্বীকার করা দরকার। অবশ্যই ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে একটা সুবিধেবাদী সাম্প্রদায়িক দলের পার্থক্য আছে। অবশ্যই যে রাজনীতি খোলাখুলিভাবে গর্বিতভাবে ঘৃণা প্রচার করছে তার সঙ্গে, যে রাজনীতি সুকৌশলে মানুষকে পরস্পরের বিদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে তার তফাৎ আছে।

এবং অবশ্যই আমরা জানি একজনের উত্তরাধিকার আমাদের অন্যজনের আতঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এ দুয়ের মাঝখানে আলাদা কোনো বাছাই করার সুযোগ যে থাকতে পারে--- যা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আমাদের দিতে পারত বলে মনে হয়---এরা দুজন সেই সুযোগটাই মুছে দিচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট এই উন্মত্ততার এই সু - ভিত্তির পরিবেশ যে সংবাদ মাধ্যমের মধ্য-মঞ্চ দখল করে নিচ্ছে তার কারণ প্রত্যেকে এই জ্ঞানে নিদ্বেগ যে যে - কেউ জিতুক স্থিতাবস্থা মূলত অপ্রতিস্পর্ধী থাকবে। (লোকসভায় আবেগমথিত ভাষণের পর কোনো রাজনৈতিকদলেরই নির্বাচনী প্রচারে পোটা বাতিলের প্রস্তাবটি অগ্রাধিকার পায় নি। তারা প্রত্যেকেই জানে একভাবে বা অন্যভাবে এটা তাদের দরকার।)

নির্বাচনের সময় বা বিরোধী পক্ষ থাকার কালে রাজ্য বা কেন্দ্রে কোনো সরকারই, বাম/ দক্ষিণ/ কেন্দ্র/ প্রদেশের, কোনো রাজনৈতিক দলই নব- উদারনৈতিকতাবাদের আওতার বাইরে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে না। 'ভেতর' থেকে বাস্তবিকই কোনো আমূল পরিবর্তন হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না নির্বাচনী কলহে প্রবেশ করা কোনো বিকল্প রাজনীতি। করি না, তার কারণ মধ্যবিত্ত - সুলভ খুঁতখুঁতে মানসিকতার জন্য নয়---'রাজনীতি হল নোংরা' বা সমস্ত রাজনৈতিক নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত।' করি না, তার কারণ আমি বিশ্বাস করি, কৌশলগতভাবে যুদ্ধটা হওয়া দরকার ক্ষমতার অবস্থান থেকে, দুর্বলতার অবস্থান থেকে নয়।

সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ এবং নব - উদারনৈতিকতাবাদের দ্বৈত আক্রমণের লক্ষ্য হল দরিদ্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের (যারা, যত সময় যাচ্ছে, আরও গরিব হচ্ছে)। যখন নব - উদারনৈতিকতাবাদ ধনী ও দরিদ্রের মাঝখানে, ভারত উদয় এবং ভারতের মাঝখানে শক্ত প্রাচীর তুলে দিচ্ছে, তখন কোনো মূলধারার রাজনৈতিক দলের পক্ষে একই সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের স্বার্থের সম্ভবত হতে পারে। একজন সম্পদশালী হিশেবে আমার 'স্বার্থসমূহ' (যদি আমি অভীষ্ট পূরণ করতে চাই) অন্ধ্রপ্রদেশের একজন গরিব কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে একেবারেই মিলবে না।

যে রাজনৈতিক দল গরিব মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে সে - দল গরিবই হবে। সে - দলের তহবিল হবে নগণ্য। আজকের দিনে তহবিল ছাড়া নির্বাচনে লড়াই করা সম্ভব নয়। কয়েকজন সমাজকর্মীকে পার্লামেন্ট পাঠানোরব্যাপারটা আগ্রহোদ্দীপক, কিন্তু বাস্তবিক রাজনৈতিকভাবে অর্থময় নয়। ব্যক্তিগত দক্ষতা, ব্যক্তিত্বের রাজনীতিতে আমাদের সমস্তশক্তি নিয়োজিত করার প্রক্রিয়ায় কোনো আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে না।

অবশ্য গরিব হওয়ার অর্থই দুর্বল হওয়া নয়। গরীবের যে শক্তি সেটি অফিস বা আদালতের ভেতরে নয়। শক্তিটা বাইরে, প্রান্তরে, পর্বতে, নদী উপত্যকায়, শহরের পথে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। দরকষাকষিটা সেখানেই করতে হবে। সংগ্রামটা সেখানেই চালিয়ে যেতে হবে।

এখন এই মুহূর্তে ওই ক্ষেত্রগুলো হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা দখল করে নিয়েছে। ওদের রাজনীতি নিয়ে যে কেউ ভাবলেই টের পাবেন ওরা সর্বত্র আছে, ওরা প্রচণ্ড কাজ করছে। রাষ্ট্র যখন তার দায়িত্ব ত্যাগ করছে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা আবশ্যকীয় সরকারি পরিষেষের ক্ষেত্র থেকে তহবিল প্রত্যাহার করছে, তখন সংঘ পরিবারের পদাতিক বাহিনীসেখানে প্রবেশ করছে। তাদের হাজার হাজার শাখার মর্মান্তিক মতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তারা চালাচ্ছে স্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপক কেন্দ্র। ক্ষমতাহীনতা কী --তারা বোঝে। তারা এও বোঝে যে মানুষের, বিশেষত ক্ষমতাহীন মানুষের, শুধুমাত্র নিত্যদিনের বস্তুগত গতানুগতিক জিনিশগুলোর প্রয়োজন আছে এবং আকাঙ্ক্ষা আছে তা নয়, তাদের

আবেগমূলক, আত্মমূলক, আমোদপ্রমোদমূলক জিনিশের দরকার। তারা একটু কুৎসিত পাত্র বানাচ্ছে যাতে করে দৈনন্দিন জীবনের ক্রোধ নৈরাশ্য ও অপমান, এবং অন্য এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন পরিবেশন করা যায় এবং এইসব মানবিক আবেগগুলিকে অন্য ভয়াল লক্ষে পরিচালিত করা যায়। এরমধ্যে ঐতিহ্যগত মূল ধারার বামপন্থী দলগুলি এখনও 'ক্ষমতা দখলের' স্বপ্ন দেখে চলেছে, কিন্তুসময়ের দাবিকেস্বীকার করে নিতে তাদের ঘোর অনীহা। তারা নিজেদের ভেতর অবদ্ধ, এবং এমন এক অগম্য বৌদ্ধিক অবস্থানে সরে গিয়েছে যেখান থেকে তারা যে প্রত্নভাষায় তর্ক করে অতি অল্প মানুষেরই তা বোধগম্য হয়।

সংঘ পরিবারের প্রচণ্ড আত্রমণের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারছে শুধু অল্প কয়েকটি তৃণমূলস্তরের প্রতিরোধ আন্দোলন। 'উন্নয়নের' সাম্প্রতিক মডেলগুলি মানুষকে যেভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, মানুষের ওপর সন্ত্রাস নামিয়ে আনছে--- এই আন্দোলনগুলি তারই প্রতিত্রিয়ায় সৃষ্ট বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলনগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং (যদিও তাঁদের নামে নিরন্তর অভিযোগ করা হয় তাঁরা বিদেশি টাকা পান, তাঁরা বিদেশি এজেন্ট) তাঁরা প্রায় বিনা অর্থে কাজ করে চলেছেন এবং তাঁদের সম্পদ বলতে একেবারেই কিছু নেই। আগুনের বিদ্ধে তাঁরা চমৎকার লড়াই করছেন, তাঁদের পিঠ ঠেকেছে দেয়ালে। কিন্তু তাঁরা মাটিতে কান পেতে রয়েছেন। কঠোর বাস্তবতার স্পর্শে আছেন তাঁরা। যদি তাঁরা একত্রিত হতে পারেন, যদি তাঁরা সমর্থন পান এবং শক্তিসঞ্চয় করতে পারেন, তাহলে গণ্য হবার মতো একটা বল হিশেবে তাঁরা একত্রিত হতে পারেন, তাঁরা বেড়ে উঠতে পারেন। তাঁদের যুদ্ধ, যখন লড়াই হবে--- একটা আদর্শ যুদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে--- অনমনীয় মতান্ধ যুদ্ধ হবে না।

এই সময়, যখন সুবিধেবাদকেই সব মনে হচ্ছে, যখন প্রত্যাশা পরাজিত, যখন সবকিছুই বিশ্বাসহীন বাণিজ্যিক রফায় পর্যবসিত হচ্ছে, তখন আমাদের স্বপ্ন দেখার সাহস রাখা দরকার। রোমান্সকে পুনদ্ধার করা প্রয়োজন। ন্যায় বিচার স্বাধীনতা ও মর্যাদার ওপর আস্থা রাখা রোমান্স। প্রত্যেকের জন্য সাধারণ ক্ষেত্রটা আমাদের খুঁজে বের করা দরকার -- আর তা করতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে এই বিশাল প্রাচীন যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করে চলেছে--- কে এর পক্ষে আর কে এর বিপক্ষে কাজ করছে। কে খরচ করছে আর কে মুনাফা নিচ্ছে।

সারা দেশ জুড়ে যে অনেক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে একটামাত্র বিষয় নিয়ে লড়াই করছে, তাঁরা উপলব্ধি করছেন স্থান - কালের ওপর নির্ভরশীল তাঁদের বিশেষ স্বার্থের রাজনীতি এখন তেমন আর যথেষ্টনয়। তাঁরা অনুভব করছেন তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাঁদের আন্দোলন ঈপ্সিত ফললাভে অক্ষম, তবু কৌশলগত ভাবে অহিংস প্রতিরোধকে পরিত্যাগ করার যথেষ্ট কারণ নেই। বরং আত্মবিশ্লেষন করা আত্যন্তিকভাবে দরকার। দরকার দৃষ্টির। আমরা যারা বলছি আমরা গণতন্ত্রকে পুনদ্ধার করতে চাই--তাঁদের কাজের পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক ও সমানাধিকারের মূল্যবোধকে মান্য করে চলা দরকার। যদি আমাদের লড়াইটা মতান্ধ হয় তাহলে আমরা আমাদের ভেতরে যে অবিচার সংগঠিত করে চলেছি, ---একে অপরের বিদ্ধে, নারী ও শিশুর বিদ্ধে---সেই অবিচারেরসীমা বাস্তবিকই নির্ধারণ করতে পারব না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্ধে যাঁরা লড়াই করছে তাঁরা যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে না থাকেন। যাঁরা বাঁধ বা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাঁরা যেন সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা জাত - পাতের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব ছড়াতে বিরত না থাকেন --- এমনকি তাঁদের এই মূহূর্তের সাময়িক সাফল্যকে বাদ দিয়েও সেটা করা দরকার। যদি সুবিধেবাদ এবং ফন্দিফিকির আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা দখল করে নেয়, তাহলে মূলধারার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্যই থাকবে না। যদি ন্যায়বিচার আমরা চাই সেটা হবে ন্যায়বিচার এবং সকল মানুষের সমান অধিকার---শুধু বিশেষস্বার্থের সংস্কার নিয়ে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর জন্য নয়। এখানে কোনো সমঝোতা চলবে না।

আমরা অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভালো আছি-র রাজনৈতিক নাট্যে রূপান্তরিত করেছি---- যারা সার্বাধিক সাফল্য প্রচার মাধ্যমের করে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, এবং ন্যূনতম সাফল্যের কথা যদি বলা হয় তাহলে বলাদরকার আন্দোলনটাই উপেক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার, প্রতিরোধের কৌশল সমূহ নিয়ে জরি আলোচনার দরকার, সত্যিকারের যুদ্ধে নামা এবং সত্যিকারের ক্ষতিসাধনে তৎপর হওয়া দরকার। আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন ডান্ডি অভিযান কেবলমাত্র সুন্দর র

াজনৈতিক নাটক ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতিকে তা ভেতর থেকে আঘাত হানতে চেয়েছিল।
রাজনীতির অর্থটি আমাদের পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। নাগরিক সমাজের অসরকারিকরণে'র তৎপরতা আমাদের ঠিক উল্টো পথে চালিত করে। তা আমাদের রাজনীতিবিমুখ করে। তা আমাদের আনুকূল্য ও স্বহস্তদানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। আইন অমান্যের অর্থটা আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার
হয়ত আমাদের দরকার লোকসভার বাইরে একটা নির্বাচিত ছায়া পার্লামেন্ট, যার সমর্থন ও সম্মতি ছাড়া সত্যি - পার্লামেন্ট সহজে কাজ করতে পারবে না। সেই ছায়া পার্লামেন্ট যা ভূমিতলের প্রতিটি ধ্বনিকে উর্ধে তুলে ধরবে, যেখানে সমস্ত বৌদ্ধিক জ্ঞান ও তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে (মূলধারার সংবাদমাধ্যমে যা ক্রমশ অলভ্য হয়ে উঠেছে)। ভয়হীনভাবে, কিন্তু অ-হিংসভাবে আমরা এই যন্ত্রের অঙ্গহানি ঘটাতে থাকব, যা আমাদের গ্রাস করছে।
আমাদের বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদিও আমরা বলছি সন্ত্রাসের বৃত্তটা আমাদেরর ঘিরে ফেলেছে। যে কোনো পথেই পরিবর্তনটা আসবেই। হতে পারে সে - পথ রক্তাক্ত, হতে পারে সে - পথ সুন্দর।

১। লেখক এখানে Non-Government Organization -এর অন্দোলনের কথা বলেছেন। মূলে আছে 'Ngo'isation শব্দটি।
অনুবাদ অনুপ চৌধুরী।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com